International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 386-392
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.233

পুরুষার্থ চতুষ্টয় ও সমকালীন নৈতিক সংকট: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

নাড়ুগোপাল প্রসাইত
প্রাক্তন ছাত্র, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 16.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the Indian philosophical tradition, the Puruṣārtha-catuṣṭaya – Dharma, Artha, Kāma and Mokṣa – presents an integrated philosophy of life as the supreme goal and ethical guide of human existence. The objective of this research paper is to evaluate the contemporary relevance of the Puruṣārtha-catuṣṭaya through a theoretical analysis of its foundational principles. First, the distinct meaning, purpose, and ethical significance of each Puruṣārtha are explained. Subsequently, their interrelationship has been analyzed to demonstrate that they are not isolated concepts but rather integral components of a unified moral framework. The discussion establishes that Dharma regulates and guides Artha and Kāma, while Mokṣa directs the individual toward ethical self-realization and ultimate fulfillment. In the present consumerist, self-centered, and technology-driven society, individualism, erosion of values, and moral confusion are steadily increasing. In this context, the Puruṣārtha-catuṣṭaya prevents human life from being confined merely to enjoyment or material success and instead guides it toward ethical balance, self-restraint, and spiritual advancement. Therefore, a re-evaluation of the Puruṣārtha-catuṣṭaya is highly relevant for addressing the contemporary moral crisis.

Keywords: Puruṣārtha, Dharma, Artha, Kāma, Mokṣa, Ethics.

ভূমিকা:

নীতিবিদ্যা মানুষকে নৈতিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চায়, যা মানুষের ইহজীবনকে পূর্ণতা দান করে। এই নৈতিকতার আদর্শের আলোকেই মানুষ তার জাগতিক কর্মসমূহের মূল্যায়ন করে। নীতিবিদ্যার আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে নৈতিকতার ধারণা। ভারতীয় নীতিবিদ্যায় নৈতিকতার এই ধারণাটি হল 'পুরুষার্থের' ধারণা। ভারতীয় দর্শনে মানব জীবনের একাধিক উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে, তাদের একত্রে পুরুষার্থ বলা হয়। 'পুরুষার্থ' শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত 'পুরুষ' ও 'অর্থ'। এখানে 'পুরুষ' বলতে বোঝায় 'সচেতন মানুষ'কে এবং 'অর্থ' বলতে বোঝায় মানুষের 'কাম্যবিষয়'কে। কাজেই ব্যুৎপত্তিগত ভাবে পুরুষার্থ হল 'সচেতন মানুষের কাম্যবিষয়'। পুরুষার্থ প্রসঙ্গে বলা হয়– *"যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে, স পুরুষার্থঃ।"* অর্থাৎ 'যার দ্বারা পুরুষ প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ পুরুষ যা পরম কাম্য বলে গ্রহণ করে তাই পুরুষার্থ'।[১] মহর্ষি জৈমিনি তাঁর মীমাংসাসূত্র গ্রন্থে (৪/১/২) বলেছেন– *"যস্মিন প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিপ্সার্থ লক্ষণ অবিভক্তত্বাৎ।"* অর্থাৎ 'যে বিষয়ে মানুষের প্রীতি হয়, তাহাই পুরুষার্থ। তাহার যে লিপ্সা বা অনুষ্ঠান তাহা অর্থত অর্থাৎ স্বাভাবিক অনুরাগবশত প্রাপ্ত'।[২] পুরুষার্থের সংখ্যা বিষয়ে কিছু মতভেদ বর্তমান।

অনেকের মতে আদিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই পুরুষার্থের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীকালে 'মোক্ষ' নামক চতুর্থ পুরুষার্থ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ একত্রে চতুর্বর্গ রূপে গণ্য হয়েছে। মানবজীবনের লক্ষ্য ও নৈতিকতা নিয়ে ভারতীয় দর্শনে সুপ্রাচীনকাল থেকেই গভীর চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। এই ধারায় পুরুষার্থচতুষ্টয়– ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ মানবজীবনের চারটি মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত। এগুলি কেবল ব্যক্তিগত সাধনার বিষয় নয়; বরং সামাজিক ও নৈতিক জীবনেরও ভিত্তি। প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা মনে করতেন যে, জীবনের পূর্ণতা অর্জনের জন্য এই চারটি পুরুষার্থের সুষম সমন্বয় অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমান ভোগবাদী ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে মানবজীবনের লক্ষ্য অর্থ ও ভোগসুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। ফলে নৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয় স্তরেই মূল্যবোধের সংকট দেখা দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন জাগে– পুরুষার্থচতুষ্টয়ের ধারনা কি আজও প্রাসঙ্গিক ? এটি কি সমকামীন সমাজে নৈতিক কাঠামো হিসেবে কার্যকর হতে পারে? এই গবেষণাপত্রে পুরুষার্থচতুষ্টয়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে তাদের নৈতিক তাৎপর্য এবং বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে চারটি পুরুষার্থ পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে; তারপর তাদের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে যে, বর্তমানে নৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে এই ধারণা একটি সুসংগঠিত ও দার্শনিকভাবে সমর্থনযোগ্য নৈতিক কাঠামো প্রদান করতে সক্ষম।

ধর্ম:

ভারতীয় নীতিবিদ্যায় চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে 'ধর্ম' হল প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরুষার্থ। 'ধর্ম' শব্দটি উৎপত্তি ঘটেছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় যুক্ত করে। এখানে 'ধৃ' ধাতুর অর্থ হল 'ধারণ'। অর্থাৎ 'যা ধারণ করে, তাই ধর্ম'। ধর্মকে বলা হয়েছে *"সর্বস্য ধারকম্"*। অর্থাৎ ধর্ম সবকিছুকেই ধারণ করে।[৩] 'ধর্ম' শব্দের নানান অর্থ রয়েছে, তার মধ্যে একটি মুখ্য অর্থ হল *"ধারণাৎ ধর্মম্ ইত্যাহুঃ"*। অর্থাৎ 'ধর্ম হল তাই, যা মানুষ ও সমাজকে ধারণ করে বা রক্ষা করে। ধর্ম যেমন সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে। তেমনি সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্গলাকেও রক্ষা করে।[৪] মনুস্মৃতিতে 'ধর্ম' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ যস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধম্ প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্।।"

অর্থাৎ ধর্মের চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে– বেদ, স্মৃতি, শিষ্ট ব্যক্তির আচরণ ও নিজের সুখ।[৫] মহাভারতে 'ধর্ম' বলতে 'সদাচার ও সুনীতি' পালনকে বোঝানো হয়েছে। ঋগ্বেদে ধর্ম বলতে 'যজ্ঞকর্ম'কে বোঝানো হয়েছে। মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে ধর্মের লক্ষণে বলেছেন– *"যতোহভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ"*। অর্থাৎ 'যা হতে অভ্যুদয় বা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায় তাই ধর্ম'।[৬] মহর্ষি জৈমিনি তাঁর মীমাংসাসূত্র গ্রন্থে ধর্মের লক্ষণে বলেছেন–*"চোদনা লক্ষণঃ অর্থঃ ধর্মঃ'(১/১/২)*। অর্থাৎ 'বেদবাক্য দ্বারা লব্ধ কর্মই হল ধর্ম'।[৭] বেদে কথিত যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মই হল ধর্ম।

ভারতীয় নীতিবিদ্যায় ধর্মের একটি নৈতিক ও সামাজিক দিকও রয়েছে। ধর্ম সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করে। আধুনিক পরিভাষায় একে 'ন্যায়ধর্ম' বলা হয়। ভারতীয় নীতিবিদ্যায় একেই 'ধর্ম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ধর্মের একটি পরাতাত্ত্বিক অর্থও রয়েছে। এই অর্থে ধর্মকে 'বিশ্বনীতি' বা 'ঋত' বলা হয়েছে। 'ঋত' হল তাই যা, বিশ্বজগতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। 'ধর্ম' শব্দটির নানান অর্থ থাকলেও প্রশ্ন হয় যে, পুরুষার্থ রূপে ধর্ম কী? 'ধর্ম' শব্দটির দ্বারা ভারতীয় নীতিবিদ্যায় 'কর্তব্য'কে বোঝায়। এই 'কর্তব্য' কেবল

নৈতিক নয়, এর একটি সামাজিক দিকও রয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যে কেবল নৈতিক কর্তব্য পালন করে তা নয়, সমাজে তার আশ্রম ও বর্ণ অনুযায়ী কর্তব্য নির্ধারিত হয়। 'আশ্রম' বলতে 'জীবন-যাপন প্রণালী'কে বোঝায়। আশ্রম চারটি– ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চতুর্বিধ আশ্রম হল মানুষের জীবনের চারটি পর্যায়। এই পর্যায় অনুযায়ী মানুষের কর্তব্য নির্ধারিত হয়। এবং 'বর্ণ' বলতে 'মানুষের মানসিক প্রবণতাকে' বোঝায়। বর্ণও চতুর্বিধ– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। প্রত্যেক মানুষের কিছু সাধারণ ধর্ম আছে, যা সকল মানুষের ক্ষেত্রেই আশ্রম ও বর্ণ নিরপেক্ষভাবে পালনীয়। আবার মানুষের কিছু বিশেষ ধর্ম বা কর্তব্য আছে, যেগুলি মানুষের আশ্রম ও বর্ণ অনুযায়ী পালনীয়। শাস্ত্রাকার মনু বলেছেন– ধর্ম ও সত্য অভিন্ন। হিংসার দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ের দ্বারা ধর্ম পালনে কাউকে বাধ্য করা উচিত নয়। ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে–

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যম অপ্রিয়ম্
প্রিয়ং চ নানৃতম এষ ব্রূয়াৎ ধর্মঃ সনাতনঃ।"(৪/১৩৮)

অর্থাৎ অপরকে আঘাত না করে যা সত্য ও প্রিয় তা বলা উচিৎ, যদিও অপ্রিয় সত্য বলা উচিৎ নয়। মিথ্যা প্রিয় হলেও, তা বলা উচিৎ নয়– সনাতন ধর্ম একথাই বলে।[৮] আবারও মনুসংহিতায় (৬/১২) ধর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীবির্দ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষণম্।"

অর্থাৎ ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা, দম (সৎ আচরণ), অস্তেয় (অ-চৌর্যবৃত্তি), শৌচ (দেহ ও মনের শূচিতা), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ), ধী (শাস্ত্র জ্ঞান), বিদ্যা (অভ্যুদয়) অর্থাৎ সুখ স্বরূপ স্বর্গ ও নিঃশ্রেয়সই ধর্ম।[৯] এগুলি দৈনন্দিন জীবনে চর্চা ও চর্যা করলে মানুষ যথার্থ নৈতিক ও ধার্মিক পথে অগ্রসর হতে পারবে। ধর্ম মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল করে তোলে এবং অর্থ ও কামকে নৈতিক সীমার মধ্যে পরিচালিত করে। 'অর্থ' ও 'কাম' ধর্মের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ অর্থ ও কাম তখনই কল্যাণকর হবে যখন তা ধর্মের অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। নচেৎ ধর্ম ব্যতীত অর্থ ও কাম সহজেই ভোগবাদ ও স্বার্থপরতায় পরিণত হতে পারে।

অর্থ:

চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে 'অর্থ' হল দ্বিতীয় পুরুষার্থ। পুরুষার্থ রূপে 'অর্থ' বলতে বোঝায় 'জীবিকা অর্জনের উপায়কে'। বিষয়– সম্পত্তি, জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ, সামাজিক স্থিতি ও জীবিকা অর্জনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে অর্থ বোঝানো হয়েছে। সহজকথায় অর্থ হল বস্তু সম্পদের সাধনা, যা ব্যক্তিকে বস্তুগত আরাম প্রদান করে। মানবজীবন কেবল নৈতিক আদর্শে টিকে থাকে না– বাস্তব জীবনধারনের জন্য অর্থ অপরিহার্য। তাই ভারতীয় নীতিবিদ্যায় অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করা হয়নি; বরং তাকে মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় লক্ষ্য হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়–*"অর্থ এব হি প্রধান ইতি কৌটিল্যঃ"*। অর্থ হল সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি।[১০] মহাভারতের শান্তিপর্বে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে অর্থের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন – 'ধর্ম, কাম, স্বর্গ, আনন্দ, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান, ইন্দ্রিয়দমন প্রভৃতি অর্থের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। পর্বত থেকে যেমন অসংখ্য নদীধারা নেমে আসে তেমনি নানান জায়গা থেকে সংগৃহীত অর্থের দ্বারাই ধর্ম, কাম, স্বর্গ ও জীবনযাত্রার কাজ নির্বাহিত হয়। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে বলেছেন– *"অর্থস্য মূলম্ উত্থানম্"*। অর্থাৎ 'প্রচেষ্টাই হল অর্থের মূল'।[১১] ভারতীয় নীতিবিদ্যায় 'অর্থ' হল ইষ্ট সাধনার উপায়। ব্যবহারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থের কোনো দরকার নেই। অর্থ স্বতঃমূল্যবান নয়,

পরতমূল্যবান। অর্থাৎ অর্থকে শুধুমাত্র অর্থের জন্য কামনা করা হয় না। বরং ভোগসুখের জন্য অর্থকে কামনা করা হয়। আবার অর্থ স্বয়ংসম্পূর্ণও নয়, এটি ধর্মের অধীনস্থ। যেকোনো উপায়ে অর্জিত অর্থ পুরুষার্থ নয়, কেবলমাত্র ধর্মানুকূল অর্থই পুরুষার্থ। অর্থাৎ যে অর্থ ন্যায় ও সৎপথে অর্জিত, যা বহুজনের হিতসাধনকারী, তাই পুরুষার্থ। অপরপক্ষে যা অন্যায়ভাবে অর্জিত, চৌর্যবৃত্তি দ্বারা অর্জিত সেই অর্থ কখনোই পুরুষার্থ নয়। এছাড়াও, ভারতীয় নীতিবিদ্যায় বলা হয়েছে, যে অর্থ সৎ পথে অর্জিত, যে অর্থ সঞ্চয়ের সময় কোনো মানুষের অনিষ্টের কারণ হয়নি বা যার দ্বারা কোনো মানুষের অনিষ্ট বা হানি হয়নি বা যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি প্রতারিত হয়নি, সেই ন্যায়লব্দ অর্থই প্রকৃত অর্থ এবং এরূপ অর্থই দানের যোগ্য। অর্থাৎ এরূপ অর্থ যজ্ঞে ব্যবহৃত হতে পারে। এরূপ অর্থকে 'বৈধ অর্থ' বলা হয়। অর্থ স্বার্থকতা লাভ করে তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। অর্থের ব্যবহার যাতে সংযত হয়, সহজকথায়, সংসার ধর্ম পালনের জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন হয়, তেমনি শাস্ত্র বিহিত অনুষ্ঠানের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থ তখনই মোক্ষ লাভের সহায়ক হবে যখন তা ধর্মানুসারী হবে। সকল প্রকার সুখের মূলে রয়েছে ধর্ম এবং ধর্মের মূলে রয়েছে অর্থ।

"সুখস্যমূলম্ ধর্মঃ।
ধর্মস্যমূলম্ অর্থঃ।।"[১২]

কাম:

কাম হল তৃতীয় পুরুষার্থ। 'কাম' শব্দের সাধারণ অর্থ হল – কামনা , প্রেম, লোভ, ভালোবাসা, ইন্দ্রিয়সুখভোগ ইত্যাদি। তবে সংকীর্ণ অর্থে কাম বলতে বোঝায় 'দৈহিক সুখকে'। যে ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গী, তার কাছে জীবনের চরম বা পরম লক্ষ্য মোক্ষ লাভ, তবে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তিমার্গী হওয়ায় তারা স্বাভাবিকভাবেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত থাকে না। ফলে তাদের অর্থ ও কামের প্রতি আকাঙ্খা তীব্র হয়। কামের চরম পরিতৃপ্তি অসম্ভব, ফলে কাম যদি প্রশ্রয় পায় সেক্ষেত্রে কাম তৃপ্ত হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মানুষ যতই ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে ইন্দ্রিয়ের ভোগলিপ্সা ততই বৃদ্ধি পায়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে *"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"*। অর্থাৎ স্ত্রী কোনো ভোগ সামগ্রী নয়, স্ত্রী সহধর্মিনী। স্ত্রী স্বামীর ধর্মাচরণে সহায়তা করবেন।[১২] সহজকথায় যে কাম অসংযত তা লালসা। আর লালসা ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং তা আধ্যাত্মিক জীবনেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে অর্থকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যেমন ধর্মের কথা বলা হয়েছে, তেমনি কামকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও ধর্মের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ কাম চরিতার্থ করবে ধর্মের পথ অবলম্বন করে। ধর্ম কামকে ততটাই প্রশ্রয় দেয় যতটা, তা মানুষকে বেঁচে থাকার প্রেরণা দেয়। কাম ছাড়া গৃহস্থের সংসার জীবন পালন করা সম্ভব নয়। কাম একটি জৈবিক ক্রিয়া হলেও এর উদ্দেশ্য বংশগতিকে অক্ষুন্ন রাখা। ভারতীয় নীতিবিদ্যায় বলা হয়েছে যে, কাম নিজে সুখ স্বরূপ হলেও, তা সুখ লাভের উপায় নয়। কাজেই ধর্মের মাধ্যমে কামকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং কাম যদি এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলায় থেকে মানুষকে ইষ্ট লাভে সহায়তা করে, তবেই সেই কাম হবে পুরুষার্থ।

মোক্ষ:

চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ হল চতুর্থ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। সাধারণভাবে মোক্ষ শব্দের অর্থ হল 'যা কিছু দুঃখ দায়ক তার থেকে চিরনিবৃত্তি বা মুক্তি'। এই অবস্থা লাভ করলে জীবন পরিপূর্ণ হয় এবং মানুষের জন্ম চক্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। মোক্ষকে ভারতীয় নীতিবিদ্যায় পরম পুরুষার্থ রূপে গণ্য করা হয়েছে। কারণ ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে মোক্ষ অভিমুখী করে তোলা। সহজকথায় মোক্ষ লাভের দ্বারাই ধর্ম, অর্থ ও কাম সার্থকতা বা পরিপূর্ণতা লাভ করে। চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে একমাত্র 'মোক্ষ' হল

এমন পুরুষার্থ যাকে স্বতঃমূল্যবান বলা হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম এগুলি সরাসরি সুখ নয়, এগুলি হল সুখের হেতু। কিন্তু মোক্ষ হল সাক্ষাৎ সুখ স্বরূপ। সহজকথায় মোক্ষ যেহেতু সর্বোত্তম ও অক্ষয় সুখ স্বরূপ, তাই মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়। ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ শব্দটির নানান প্রতিশব্দ লক্ষ্য করা যায়, যথা– নির্বাণ, কৈবল্য, অপবর্গ, নিঃশ্রেয়স, মুক্তি আদি। এখন প্রশ্ন হল মোক্ষ বা মুক্তি বলতে কি বোঝায়? এর উত্তর প্রসঙ্গে বলা হয়, মোক্ষ হল দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি, জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি, মোক্ষ হল আত্মোপলব্ধি। মোক্ষ হল অবিদ্যার বিনাশ ঘটিয়ে সম্যকজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞান লাভ। মহাভারতে 'বাসনার নিবৃত্তিকে' মোক্ষ বলা হয়েছে। পদ্মপুরানে 'সুখ-দুঃখদায়ক কর্মের বিনাশ'কে মোক্ষ বলা হয়েছে। গরুড় পুরানে 'ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের একত্ব হওয়া'কে মোক্ষ বলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন গুলিতেও মোক্ষকে নানানভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– চার্বাক মতে চেতনা যুক্ত দেহই হল আত্মা। দেহের অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয়। জৈন দর্শনে মোক্ষ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে *"সম্যগদর্শন-জ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ"*। অর্থাৎ সম্যকদর্শন, সম্যকজ্ঞান ও সম্যক চারিত্রের অনুশীলনের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়।[১৪] গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধ দর্শনে অবিদ্যাকে দুঃখের মূল কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বৌদ্ধ মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য আমাদের সবার আগে অবিদ্যার বিনাশ ঘটাতে হবে। অবিদ্যার বিনাশ হলে সংস্কার, সংস্কারের বিনাশ হলে বিজ্ঞান এভাবে ক্রমে ক্রমে ভব, জাতির বিনাশ ঘটলে দুঃখেরও বিনাশ ঘটবে এবং নির্বাণ লাভ হবে। মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্র গ্রন্থে বলেছেন –*"তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ"*। অর্থাৎ জীবের সকল প্রকার দুঃখ থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল অপবর্গ বা মোক্ষ।[১৫] মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে, পুরুষ ও প্রকৃতির অভেদ জ্ঞানই হচ্ছে পুরুষের বন্ধনের কারণ। ফলে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। এভাবেই ভারতীয় প্রায় সকল দর্শন সম্প্রদায়গুলিতেই মোক্ষ বা মুক্তি লাভের নির্দিষ্ট উপায়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তি জীবনমুক্তি ও বিদেহমুক্তি ভেদে দ্বিবিধ। কিছু সম্প্রদায় কেবল জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাসী, কিছু সম্প্রদায় কেবল বিদেহ মুক্তিতে বিশ্বাসী। আবার কিছু দর্শন সম্প্রদায় উভয় প্রকার মুক্তিতেই বিশ্বাসী।

সমকালীন নৈতিক সংকটে পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের প্রাসঙ্গিকতা:

ধর্ম ও সমকালীন নৈতিক সংকটে তার প্রাসঙ্গিকতা: বর্তমান সমাজে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে দ্রুতগতিতে প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মানুষের মন অনেক সময় নৈতিকতাকে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে ধর্ম উপেক্ষিত হলে অর্থ ও কামের ভারসম্য বিঘ্নিত হয়। ধর্ম সামাজিক স্থিতিশীলতার ভিত্তিরূপে কাজ করে। মহাভারতে ধর্ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –'ধর্ম জগতের মানুষকে একত্রে ধরে রাখে'। বর্তমান সমাজের পরিবারের প্রতি দায়-দায়িত্ব, সহিষ্ণুতা, পরোপকার ইত্যাদি গুণ, ধর্মের মধ্যে নিহিত। ধর্ম মেনে চললে মানুষের মধ্যে সততা, করুণা ও ন্যায়পরায়ণতা অক্ষুন্ন থাকে এবং মানুষের মধ্যে ধৈর্য ও সৎ আচরণের বিকাশ ঘটে। ফলে সামাজিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ধর্মের ভূমিকা আজও অপরিসীম। এছাড়াও ব্যক্তিগত উন্নয়নেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম মানুষকে স্বভাবগত ও গুণগতদিক থেকে সমৃদ্ধ করে। বর্তমান সময়ে জীবনে মানসিক চাপ ও বিভ্রান্তি কমানোই ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

অর্থ ও সমকালীন নৈতিক সংকটে তার প্রাসঙ্গিকতা: ভারতীয় নীতিবিদ্যায় অর্থ, সম্পদ অর্জনের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। অর্থ সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন প্রকার কর্মসংস্থান, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে সুস্থ রাখা যায়। এছাড়াও, বর্তমান বিশ্বে পরিবারের প্রয়োজন পূরণে, শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রেও আর্থিক সক্ষমতা থাকাটা জরুরী। তবে ভারতীয় নীতিবিদ্যা অনুযায়ী অর্থকে হতে হবে ধর্মানুসারী।

কাম ও সমকালীন নৈতিক সংকটে তার প্রাসঙ্গিকতা: মানুষের জীবনে কাম বা কামনা, প্রেম, ভালোবাসা, ইন্দ্রিয়সুখভোগ ইত্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম। কাম মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য দিক, ধর্মের সীমার মধ্যে থেকে যার চর্চা করা উচিত। কাম পরিবার ও সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করে। কাম মানব জীবনে আনন্দ ও শান্তি আনে। আধুনিক মনস্তত্ত্বেও একথা স্বীকৃত যে, যখন ব্যক্তির কামনা-বাসনা ও আকাঙ্খাগুলি নিয়ন্ত্রিত থাকে তখনই ব্যক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। বর্তমান ভোগবাদী সমাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থার ফলে কাম এক নতুন রূপ ধারণ করেছে। বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন এবং সর্বোপরি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি মাধ্যমগুলির দ্বারা মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্খা ক্রমাগত উদ্দীপিত হচ্ছে। বর্তমান সমাজে এর যেমন কিছু ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে তেমনি কিছু নেতিবাচক প্রভাবও পড়ছে। কাজেই এমন পরিস্থিতিতে কামকে প্রাচীন নীতিবিদ্যার আলোকে ধর্ম ও নৈতিকতার সহিত নতুন ভাবে আজকের সমাজে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি।

মোক্ষ ও সমকালীন নৈতিক সংকটে তার প্রাসঙ্গিকতা: মোক্ষ শুধুমাত্র কোনো পরলৌকিক ধারণা নয়; বরং মোক্ষ হল মানসিক শান্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ। বর্তমান সমাজে প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নতির ফলে যেমন মানুষের জীবন চর্চা এক উন্নত রূপ ধারণ করেছে তেমনি দিনে দিনে বেড়ে চলেছে কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, আর্থিক অনিশ্চয়তা, মানসিক চাপ, দুর্নীতি, হিংসা ও স্বার্থপরতা। এমন পরিস্থিতিতে 'মোক্ষ' মানুষকে মানসিক, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও আত্মসংযমের পথ দেখায়। মোক্ষ মানুষকে নৈতিক ও দায়িত্বশীল হতে শেখায়। যার পরিণাম বশত আধুনিক বিশ্বে ধ্যান, যোগ ও আত্মবিশ্লেষণের চর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এই মোক্ষ কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্যই নয় বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো মানুষই এই পথ অবলম্বন করতে পারে এবং মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে।

উপসংহার:

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ মানবজীবনের একটি সামগ্রিক আদর্শ। এই গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছে যে, চতুর্বর্গ পুরুষার্থ মানবজীবনের চারটি বিচ্ছিন্ন লক্ষ্য নয়; বরং এটি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহুমাত্রিক বিকাশের একটি সামগ্রিক তত্ত্ব। ধর্ম নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলে, অর্থ জীবনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে, কাম আনন্দ ও আকাঙ্খাকে সংযত রাখে এবং মোক্ষ হল আত্মোন্নয়নের পথ। মোক্ষ মানবিক পরিপূর্ণতাকে নির্দেশ করে। মোক্ষলাভে সকল প্রকার দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। ভারতীয় নীতিবিদ্যার চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে কাম ও মোক্ষ মানব অস্তিত্বের দুটি বিপরীত অথচ পরিপূরক দিক। একদিকে কাম যেমন মানুষের স্বাভাবিক, দৈহিক ও মানসিক চাহিদার প্রতিফলন; অন্যদিকে মোক্ষ সেই চাহিদার সীমা অতিক্রম করে আত্মোপলব্ধির সাধনা। এই দুইয়ের সমন্বয়েই মানবজীবন পূর্ণতা লাভ করে। বর্তমান সমাজে দ্রুত প্রযুক্তিব্যবস্থার উন্নতি, নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে মানুষের জীবন যাত্রায় আমূল পরিবর্তন এসেছে এবং 'কাম' নতুন ভাবে সামাজিক ও নৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনে দিনে ক্রমশ বেড়ে চলেছে মানসিক অশান্তি, সম্পর্কের মূল্যবোধের অবক্ষয়। ফলে কামকে ঐরূপ নিয়ন্ত্রণহীন ভোগে পরিণত না করে, নৈতিক উপায়ে পরিচালিত করার প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে বেশি। আবার এত উন্নতির পরেও মানুষ যেন মানসিক শান্তি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। বেড়ে চলেছে আত্মহত্যা, হতাশা, উদ্বেগ ও একাকীত্ব। এই প্রেক্ষাপটে মোক্ষ কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়; এটি হল মানসিক ভারসাম্য, আত্ম সচেতনতা। মোক্ষ মানুষকে শেখায় যে বাহ্যিক সুখই প্রকৃত সুখ নয়, আত্ম উপলব্ধিই প্রকৃত সুখ। সহজকথায়, কাম যেমন জীবনকে গতি দেয় তেমনি মোক্ষ জীবনকে লক্ষ্য বা পরিণতি দেয়। অতত্রব কামকে ধর্মের আলোকে নিয়ন্ত্রিত করে ও অর্থের সাহায্যে সুশৃঙ্খলভাবে উপভোগ করে,

মোক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়াই হল ভারতীয় নীতিবিদ্যার আদর্শ। বর্তমান সমাজে আমার এই গবেষণাপত্রটির প্রাসঙ্গিকতা বহুমাত্রিক। কারণ এটি ব্যক্তিগত জীবনে মানসিক ও নৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। ভোগবাদের বিপরীত মানুষকে সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়।

তথ্যসূত্র:

১. শাস্ত্রী, পঞ্চানন: চার্বাক দর্শনম্, পৃ-১৬।
২. ভট্টাচার্য, সুখময়: পূর্বমীমাংসা দর্শন, পৃ-৯৫।
৩. গুপ্ত, দীক্ষিত, নীতিশাস্ত্র, পৃ-২২।
৪. মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৬৯/৫৮ ।
৫. মনুসংহিতা ৮/১৫ ।
৬. বৈশেষিক সূত্র - ১/১/২ ।
৭. ভট্টাচার্য, সুখময়, পূর্বমীমাংসা দর্শন, পৃ-১২ ।
৮. মনুসংহিতা ৪/১৩৮ ।
৯. তদেব ৯২/৬ ।
১০. চাণক্য সূত্র - ৬১ ।
১১. অর্থশাস্ত্র ১/১৯/৩৪।
১২. চাণক্য সূত্র - ১/২ ।
১৩. মনুসংহিতা ৯/৯৬ ।
১৪. তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র ১/১ ।
১৫. ন্যায়সূত্র ১/১/২২।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, পঞ্চানন (অনুদিত)। চার্বাক দর্শনম্। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
২. শাস্ত্রী, দক্ষিনারঞ্জন। চার্বাক দর্শন। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।
৩. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (বঙ্গানুবাদ)। সব্বদর্শন সংগ্রহ (সায়ন মাধবীয়)। সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।
৪. ভট্টাচার্য, সুখময়। পূর্বমীমাংসা দর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।
৫. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। মহাভারত (নীতি·অনীতি·দুর্নীতি)। দীপ প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় দীপ সংস্করণ, ২০২৪।
৬. ভট্টাচার্য, গোপীনাথ। ভারতীয় দর্শন ও তার বিশিষ্ট পটভূমিকা। তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৫ খ্রীষ্ঠাব্দ।
৭. সেন, দেবব্রত। ভারতীয় দর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ; আগস্ট ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।
৮. পাল, ড.বিপদভঞ্জন। ভারতীয় দর্শন। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর,২০১৪।
৯. মন্ডল, প্রদ্যেত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ খ্রীষ্টাব্দ।
১০. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় নীতিবিদ্যা। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: অক্টোবর, ২০১৪।
১১. গুপ্ত, দীক্ষিত। নীতিশাস্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭।
১২. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। সাম্মানিক নীতিবিদ্যা। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫।